শালতোড়া নেতাজী সেনি□নারী কলেজ
শালতোড়া, বাঁকুড়া
উপস্থাপনা – পীযূষকান্তি চক্রবর্ত্তী
বিভাগ – শারীরশিক্ষা
বর্ষ – প্রথম সেমিষ্টার

বিষয় ঃ শারীরশিক্ষার গুরুত্ব

শারীরশিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রম ও খেলাধুলা মানুষের শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক বিভিন্ন দিকের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে মানবজীবন তথা সমগ্র সমাজকে উন্নত, দৃঢ় ও মজবুত করে তোলে। মানবজীবনে শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলার গুরুত্ব আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) শিশুর যথাযথ শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ঃ

১। **দৈহিক গঠন ঃ** শারীরশিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রম ও খেলাধুলা শৈশবে শিশুর পেশি ও অস্থির সম্পূর্ণ বিকাশের পরিপূরক। বয়সের অনুপাতে যথোপযুক্ত খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষার কার্যক্রম শিশুর অন্তঃস্থ বিভিন্ন যন্□তন্□র কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যা শিশুকে শারীরবৃত্তীয়ভাবে সুস্থসবল রাখে। চাহিদামতো খেলাধুলা শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত করে।

২। **মানসিক বিকাশ ঃ** সুস্থ শরীরই হলো সুস্থ মনের আধার। তাই খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষার অভিজ্ঞতা শিশুকে যেমন মানসিকবাবে দৃঢ় ও কঠোর করে তুলতে সাহায্য করে, তেমনি শিশুর মানসিক বিকাশকে পরিপূর্ণ করতেও সাহায্য করে।

৩। স্নায়ু-পেশির সমন্বয়সাধন ঃ শারীরশিক্ষার কার্যক্রম ও খেলাধুলার মাধ্যমে স্নায়ু ও পেশির সুসমন্বয় সাধিত হয়। সহখেলোয়াড়দের অবস্থান, গোলপোসে□র দূরত্ব, ভলিবল নেটের উচ্চতা ইত্যাদি বিষয় চোখ দিয়ে দেখে, স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে□ খবর পাঠানো হয়। মস্তিষ্ক□ সেই খবরের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পেশিকে খবর পাঠায় সংকুচিত বা প্রসারিত হবার জন্য। এই সংশ্লিষ্ট পেশি সংকুচিত বা প্রসারিত হবার ফলে একজন খেলোয়াড় তার সহখেলোয়াড়দের অবস্থান অনুযায়ী পাশ বাড়াতে পারে বা দূরত্ব বুঝে শক্তিপ্রয়োগ করতে পারে। এই স্নায়ু-পেশির সুসমন্বয়ের অভ্যাস খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষার কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত হচ্ছে, যা আমাদের খেলার মাঠের বাইরে প্রতিদিনের কাজকর্মকে আরো নিরাপদভাবে সম্পন্ন করতে এবং কম শক্তি ক্ষয় করে বেশি পরিমাণ কাজ করবার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এর ফলে নিরাপদ কর্মবহুল, সতেজ জীবন অতিবাহিত করা যায়।

৪। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির পর্যাপ্ত ক্ষরণ ঃ শারীরশিক্ষার কার্যক্রম ও নিয়মিত খেলাধুলা শৈশব থেকেই পর্যাপ্ত হরমোন ক্ষরণে সাহায্য করে, যা শৈশব ও পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিকে হরমোন সংক্রান্ত ব্যাধি থেকে দূরে ৱাথখে ও সুস্থ, নীরোগ সমজা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষার কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিশুর পর্যাপ্ত, ধারাবাহিক, শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ, শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সমস্ত তন্ে□র যথাযথ কার্যক্ষমতা ভবিষ্যতে এক সামগ্রিক সুস্থ, সজীব, প্রাণবন্ত সমাজ তৈরি করতে সাহায্য করে।

খ) প্রোক্ষোভিক গুণাবলির বিকাশ ঃ

১। আবেগ নিয়ন্□ণ ও শান্তিপূর্ণ সামাজ গঠন ঃ খেলাধুলার মাধ্যমে আবেগকে নিয়ন্□ণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। খেলাধুলার মধ্যে হারজিত রয়েছে। হেরে গেলে মনে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। সেই বেদনাকে উপশম করে আবার পরবর্তী খেলার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হতে হয়। ঠিক তেমনই জিতে গেলে মনে অত্যন্ত আনন্দের সৃষ্টি হয়। সেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলে, পরবর্তী খেলায় সফলতা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। খেলার মধ্যে বিপক্ষ দল অন্যায় আচরণ করলে মনে রাগ অনুভূত হয়, কিন্তু সেই রাগের বশবর্তী হয়ে বিপক্ষকে আক্রমণ করলে খেলার

মাঠ থেকে বিদায় নিতে হয়। তাই খেলাধুলা আমাদের আনন্দ, দুঃখ, রাগ ইত্যাদি আবেগকে নিয়ন্□ণ করতে শেখায়, যে শিক্ষা পরবর্তী সময়ে প্রাত্যহিক জীবনেও প্রতিফলিত হয়। মানুষের বিভিন্ন আবেগকে নিয়ন্□ণ করে উপদ্রবহীন শান্তিপূর্ণ সমজা গড়ে তুলতে শারীরশিক্ষা এবং খেলাধুলার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২। **দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা ঃ** খেলার মাঠের মধ্যে খেলা চলাকালীন খেলোয়াড়কে খেলা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কারণ বিপক্ষ দল সবসময় তার আক্রমণে বাধা সৃষ্টি করতে উদ্যত থাকে। কিন্তু খেলোয়াড়কে সেই সমস্ত বাধা ও সমস্যা অতি দ্রুত সমাধান করে তার নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে খেলার মাঠের মধ্যে অহরহ এই ধরণের সমস্যার সমাধান করা এবং সমস্যার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার প্রভাব দৈনন্দিন জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে খেলার মাঠ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা সাংসারিক জীবনে সঠিক সময়ে, দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

৩। **আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ঃ** খেলাধুলার মাঠে জয়লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম রণনীতি, কৌশল ইত্যাদি নেওয়া হয়। এর মধ্যে কোথাও সফলতা, কোথাও ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। বারংবার সফলতা, কোথাও কোথাও ব্যর্থতা খেলোয়াড়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। খেলার মাঠের বাইরে ও দৈনন্দিন জীবনে সমস্ত কাজের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। আত্মবিশ্বাস ব্যক্তি তথা সমাজকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

গ) সামাজিক গুণাবলির সক্রিয় বিকাশ ঃ

১। **বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব ও ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঃ** খেলার মাঠে দলীয় খেলায় সহখেলোয়াড়দের সাথে মিলেমিশে একটিই লক্ষ্যপূরণে সকলে সচেষ্ট থাকে, যা হলো জয়লাভ করা। সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করার ফলে সমস্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে বন্ধুভাবাপন্ন সুসম্পর্ক তৈরি হয় এবং নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। সকলে মিলে একসাথে কাজ করার, যাকে আমরা “টিম ওয়ার্ক” বলি সেই ক্ষমতা তৈরি হয়। একক খেলার ক্ষেত্রেও বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সুন্দর খেলার প্রদর্শন, অপর খেলোয়াড়কে আকর্ষিত

ও অনেক বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলে। যার ফলে খেলার মাঠে প্রতিযোগিতা থাকলেও মাঠের বাইরে দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে বন্ধুভাবাপন্ন, ভাইভাই-এর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের ফলে মাঠের মধ্যের লড়াই মাঠেই ভুলে যায়, বিপক্ষের খেলোয়াড়ের সাথে হাত মিলিয়ে, আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে মাঠের বাইরে, সমাজের মধ্যে এক সুন্দর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সমাজে ঐক্য তৈরি করতে সাহায্য করে।

২। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঃ দলীয় খেলায় কখনও দেখা হয় না যে তার দলের সহখেলোয়াড়েরা হিন্দু না মুসলিম, শিখ না বৌদ্ধ, উচ্চজাতি বা নিম্নবর্ণের। সমস্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল খেলোয়াড় তার সহখেলোয়াড়ের সাথে একাত্ম হয়ে যায় ও একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে এবং জয়লাভের লক্ষ্যে সব খেলোয়াড় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে। এর ফলে খেলোয়াড়দের মধ্যে কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি, বর্ণবিদ্বেষ, জাতিভেদ ইত্যাদি থাকে না। এবং জাতীয়তাবোধের এই গুণাবলি সমাজে সকলের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে বসবাস করতে সাহায্য করে।

৩। দেশাত্মবোধ ও আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক ঃ খেলাতে জয়লাভের সুনাম খেলোয়াড়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, রাজ্য তথা দেশের সুনামের সাথেও জড়িয়ে থাকে। তাই খেলোয়াড় যখন খেলাধুলার মাঠে থাকে তখন সে তার ব্যক্তিগত আঘাত ও সমস্যার কথা ভুলে সে যে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, রাজ্য বা দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে তার সুনামের কথা সবসময় স্মরণ রাখে। ঠিক যেভাবে এক সৈনিক তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশকে রক্ষা করবার জন্য লড়াই চালিয়ে যায়। ঠিক তেমনই খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে তার ব্যক্তিগত জীবনের কথা ভুলে তার বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, রাজ্য বা দেশের জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করে। বিদ্যালয়, রাজ্য ও দেশের প্রতি এই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা দেশকে উন্নতির দিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এক দেশের সাথে অন্য দেশের খেলা হলে দুই দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে, ফলে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার রাস্তা সুদৃঢ় হয়।

৪। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ ঃ শারীরশিক্ষার কার্যক্রম ও খেলাধুলা হলো নিয়মশৃঙ্খলার আস্তরণে মোড়া। নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙলেই পরিচালকের বাঁশি / ইঙ্গিত খেলোয়াড়কে নিয়মের মধ্যে ফিরে আসতে বাধ্য করে। তাই শৈশবকাল থেকেই শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলার আঙ্গিনায় থাকা শিশুরা নিয়মশৃঙ্খলার বশবর্তী হয়ে কাজ করতে শেখে, যা তাদের ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সমাজের নিয়মশৃঙ্খলা মেনে সুনাগরিক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করতে শেখায়, এর ফলে সামাজিক শান্তি ও অগ্রগতি অব্যাহত থাকে।

৫। নেতৃত্বদানের ক্ষমতার উন্মেষ ঃ দলীয় খেলায় একজন দলনেতা থাকে যার কাজ হলো তার দলের সমস্ত সদস্যের মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করা এবং তাদেরকে এমনভাবে নিয়োগ করা যাতে তাদের ভিতরের অন্তর্নিহিত প্রতিভাগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে দলকে সুনিশ্চিত জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। খেলার মাঠে দলনেতার এই সুনেতৃত্ব পরবর্তী সময়ে সমাজের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। খেলার মাঠে পাওয়া সুনেতৃত্বের অভিজ্ঞতা আমাদের সমাজকেও সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬। সময়ানুবর্তিতা, সহযোগী মনোভাব, মানিয়ে চলা ইত্যাদি ক্ষমতার উন্মেষ ঃ খেলাধুলা, শারীরশিক্ষার কার্যক্রম আমাদের সময়ের কাজ সময়ে করতে শেখায়, সময় সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়, যা মাঠের বাইরে উন্নত সমাজ গঠনে সাহায্য করে। দলীয় খেলায় একা সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত কাজটা করব এমন মনোবাব রাখা উচিত নয়, যা দলকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। মাঠে সহযোগী মনোভাব দলকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করে। এই সহযোগী মনোভাব সমাজকে আরো সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। খেলোয়াড়দের খেলার সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয়। ভিন্ন আবহাওয়া, ভিন্ন পরিস্থিতি, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন মানসিকতার সাথে তাদের পরিচয় হয়। সবক্ষেত্রেই নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সকলের সাথে মিলেমিশে চলার অভিজ্ঞতা খেলাধুলা এবং শারীরশিক্ষার কার্যক্রমের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়। এই মানিয়ে চলার ক্ষমতা সমাজকে শান্তিপূর্ণ রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও খেলার সূত্রে বিভিন্ন দেশ-বিদেশ ঘোরার ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। একই সাথে এক সংস্কৃতির সাথে অন্য সংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটে এবং এক সুস্থ সংস্কৃতি তৈরি হয়।

ঘ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির সক্ষমতার বিকাশ ঃ

আজকের দিনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও কিন্তু সমাজের বাইরে নয়. তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখলে সমাজের অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হয়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দুর্বলতা যাতে আরো বৃদ্ধি না পায় এবং তাদের দুর্বল অংশকে ধীরে ধীরে সবল করে তোলার ক্ষেত্রেও শারীরশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শারীরশিক্ষার একটি আলাদা শাখা রয়েছে। "সংযোজিত শারীরশিক্ষা", যেখানে শুধুমাত্র বিশেষ চাহিদাসম্পন্ম ব্যক্তিদের সক্ষমতা, সুস্থতা ইত্যাদি সম্বন্ধে চর্চা করা হয়।

ঙ) শৈশবের খেলোয়াড়ি প্রতিভার বিকাশ ঃ

শৈশবের থেকে শারীরশিক্ষা, খেলাধুলার আঙ্গিনায় থাকলে খেলাধূলার সঙ্গে প্রীতি, ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তী জীবনেও খেলাধূলার প্রতি আকর্ষণ দৃঢ় হয় যা ভবিষ্যতে একজন বড়ো খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। এর ফলে সেই খেলোয়াড়ের সামাজিক স্বীকৃতি তৈরি হয়। তাই শারীরশিক্ষার কার্যক্রম ও খেলাধুলা শিশুর অন্তর্নিহিত খেলোয়াড়ি প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সমাজে খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

চ) চাপমুক্ত শিক্ষার বিকাশ ঃ

শিশুদের বিদ্যালয়ে পড়ার চাপ এবং পরবর্তী জীবনে জীবিকানির্বাহের জন্য ব্যস্ততা, শিশু এবং ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে মেদের প্রাচুর্য বাড়ায়। শিশু এবং ব্যক্তির এই মেদবহুল শরীরে তখন বিভিন্ন ব্যাধি থাবা বসায়। শরীরে বহুমূত্র রোগ, হৃদ্যন্ে□র সমস্যা, ফুসফুসজনিত রোগ ইত্যাদি দেখা যায়। তাই শৈশব থেকেই শিশুকে পড়াশোনার সাথে সাথে শারীরশিক্ষার কার্যক্রম ও খেলাধুলার মধ্যে রাখলে শিশুর মধ্যে মেদের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পায় না এবং শৈশব থেকে খেলাধুলা

করার ফলে পরবর্তী জীবনেও খেলাধুলার অভ্যাস বজায় থাকে ও ব্যক্তি মেদবহুলতা থেকে রক্ষা পায়। শারীরশিক্ষার কার্যক্রম ও খেলাধুলা মানুষকে তার অবসর সময় সক্রিয় এবং গঠনমূলকভাবে অতিবাহিত করতে শেখায়। বহুক্ষণ ধরে টিভি দেখা, কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা, মোবাইলে ঘন্□ার পর ঘন্□া কথা বলা মানুষের অবসর সময়কে থমকে এক জায়গায় স্থির করে দেয়। শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলা মানুষকে অবসর সময় হালকা ব্যায়াম, যোগাসন, নিয়ম শিথিল করে কোনো খেলা, জগিং, হাঁটা, সাঁতার কাটা, নাট ইত্যাদির সাথে যুক্ত করে, সক্রিয় এবং গঠনমূলকভাবে জীবনযাপন করতে শেখায়।

ছ) সক্রিয় তরতাজা জীবনযাপন ঃ

শিশুর এবং পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রেও যদি অবসর সময় খেলাধুলার মধ্যে সক্রিয় গঠনমূলকবাবে অতিবাহিত করার অভ্যাস করানো যায়, তাহলে শিশু এবং ব্যক্তির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কমে যায়। অবসর সময়ে সক্রিয় গঠনমূলকভাবে না কাটালে, কুসঙ্গ, অসৎ চিন্তা, দুর্নীতি ইত্যাদি অবসর সময়ের সঙ্গী হয়ে যায়। যার ফলে শিশুদের মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে অপরাধপ্রবণত

খেলাধুলা, শারীরশিক্ষার কার্যক্রম শিশুদের ... ন্ত্বালাযন্□ণা, ব্যক্তিবিশেষের কর্মক্ষেত্রের বিরক্তি, নিত্যদিনের ... দ্বেগ ও চাপ ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে পুনরায় সক্রিয় তরতাজ ... আবার উদ্যমে কাজ করার ক্ষেত্রে খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষার গু

জ) স্বাস্থ্য ওস্বাস্থ্যকর জীবন

খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষার সাথে স্বাস্থ্য শিক্ষা ওতপ্রোতবাবে জড়িত। তাই শিশুর মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠন করতে, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতেক, দূষণ, সংক্রামক ব্যাধি নয়ন্□ণ করতে, পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলতে খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ঝ) নান্দনিক ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঃ

শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলার অন্তর্গত নাচ, জিমনাসি□কস, যোগাসন ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর মধ্যে নান্দনিক ও সৃজনশীল ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যা শিশুকে পরবর্তী জীবনে গঠনমূলক সমাজ তৈরি করতে সাহায্য করে। পরিশেষে বলা যায়, শৈশব থেকে শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলার মধ্যে থাকলে শিশুর মধ্যে সক্ষমতার উপাদানগুলির পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটে। যার ফলে শিশুর পরবর্তী জীবনে শারীরিক সক্ষমতা ব্যক্তিকে এক সবল, রোগহীন, বিপন্মুক্ত জীবন অতিবাহিত করতে সাহায্য করে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে বলা যায় শারীরশিক্ষার কার্যক্রম যে-কোনো ব্যক্তিকে শৈশব থেকে শারীরিক, মানসিক, সমাজিক, প্রাক্ষোভিক, আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক সমস্ত দিক থেকে পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে সাহায্য করে, যা সমাজের তথা দেশের সুনাগরিক হিসেবে সমাজ তথা দেশকে উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ধন্যবাদ